বাংলাদেশের সামাজিক উৎসব
অথবা, বাংলাদেশের লোকজ উৎসব

ভূমিকা: বাংলাদেশ হলো নানান বৈচিত্র্যের দেশ। ষড়ঋতুর রূপ বদলের সঙ্গে সঙ্গে এদেশের মানুষের লোকাচার ও সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। সেই সম্পর্কের সূত্র ধরেই এদেশের মানুষ পালন করে নানা রকমের উৎসব। লোকজ সংস্কৃতি ও জীবনযাপনের তাগিদে গড়ে উঠেছে লোকজ উৎসবের ঐতিহ্য। বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে নানা সময়ে লোকজ উৎসবের আয়োজন লেগেই থাকে। মূলত এ সকল উৎসবে লোকগান, পালাগান, নৃত্য প্রভৃতি সংস্কৃতি আয়োজন করা হয়। নাচে-গানে, শ্রদ্ধায়-ভক্তিতে, পারস্পরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে নিজেকে অতিব্যক্ত করতে পারে মানুষ উৎসবের দিনগুলোতে। কর্মব্যস্ততা মানুষের জীবনকে কুক্ষিগত করে রাখে। কর্মব্যস্ততার মধ্যে মানুষ কখনো কখনো স্বস্তি চাই। নানা রকমের উৎসব মানবজীবনে সেই স্বস্তি ফিরিয়ে আনে। বাংলাদেশের লোকজ উৎসবগুলো এদেশের ঐতিহ্যের বড় সম্পদ। তাই বাংলাদেশের লোকজ উৎসব সংরক্ষণ ও ধরে রাখার জন্য আমাদের সবাইকে সচেতন হতে হবে।

উৎসব : উৎসব হলো আনন্দ প্রকাশ ও লাভের অনুষ্ঠান। অর্থাৎ উৎসব এক ধরনের আনন্দনুষ্ঠান, যাকে ইংরেজিতে ‘এ জয়ফুল অব অনারিফিক সেলিব্রেশন’ বলে সংজ্ঞায়িত করা হয়। উৎসব মূলত পরিবারকেন্দ্রিক হতে পারে অথবা সমাজকেন্দ্রিকও হতে পারে। সময়ের বিবর্তনে উৎসবের কোনোটির রূপের পরিবর্তন ঘটে। আবার কোনোটি বিলুপ্ত হয় কিংবা কোনোটি নতুনভাবে সৃষ্টি হয়। উৎসবসমূহের কোনোটিতে সমাজ ও জাতীয়তার ছাপ থাকে, কোনোটিতে ধর্মের ছাপ থাকে,আবার কোনোটিতে থাকে রাজনৈতিক ছাপ। আবার লোকজীবনের নানা প্রয়োজনকে কেন্দ্র করে পালিত হয় লোকজ উৎসব। সকল উৎসবের মূলেই রয়েছে আনন্দ লাভ।

লোকজ উৎসব : লৌকিক আচার ও জীবনবোধ থেকে উৎসারিত আনন্দ প্রাপ্তির লক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানগুলোকে লোকজ উৎসব বলা হয়।

মানুষের বহুকালের জীবনযাপনের ধারাবাহিকতায় এ সকল উৎসবের প্রচলন হয়েছে। লোকজজীবনের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক রুপায়িত হয় এ সমস্ত লোকজ উৎসবে। ধর্মীয় লোকাচার কিংবা জাগতিক প্রয়োজন থেকেই লোকজ উৎসবের উৎপত্তি। কিন্তু সকলের যৌথ অংশগ্রহণে আনন্দ প্রাপ্তি মূল লক্ষ্য। অনেক লোকজ উৎসব আছে যেগুলোর সঙ্গে ধর্মের যোগ থাকলেও সেগুলো ধর্মীয় কারণে উদ্ভূত হয়নি, হয়েছিল স্বতঃস্ফূর্তভাবে; পরবর্তীতে সেগুলো আনুষ্ঠানিক উৎসবে পরিণত হয়।

লোকজ উৎসবের ধরন : বাংলাদেশের অসংখ্য লোকজ উৎসব উদযাপিত হয়। এক ধরনের লোকজ উৎসব আছে যেগুলো জীবনের অর্থনৈতিক বা উপাদানকেন্দ্রিক প্রয়োজন থেকে সৃষ্টি হয়েছে। আবার আরেক ধরনের উৎসব রয়েছে যার মূলে ধর্মীয় চিন্তা থাকলেও পরে সকলের উৎসবে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ,লোকজউৎসব গুলোতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলেরই আনন্দ উপভোগের সুযোগ ঘটে।

বাংলাদেশের লোকজ উৎসব : বাংলাদেশে অসংখ্য লোকজ উৎসব রয়েছে। নিচে প্রধান প্রধান লোকজ উৎসবের বর্ণনা তুলে ধরা হলো :

নবান্ন উৎসব : বাংলাদেশ মূলত কৃষি নির্ভর দেশ। এখানে শস্য উৎপাদনের বিভিন্ন ধাপে যে সমস্ত উৎসব, অনুষ্ঠান পালন করা হয়ে থাকে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে নবান্ন উৎসব। ‘নবান্ন’ শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ‘নতুন অন্ন’। নবান্ন উৎসব হলো বাঙালির একটি ঐতিহ্যবাহী কৃষি-উৎসব যা মূলত নতুন ধান কাটার পরে সেই ধান ঘরে তুলেই নতুন চাল দিয়ে প্রথমবারের মতো ভাত রান্না উপলক্ষে আয়োজিত উৎসব। সাধারণত অগ্রহায়ণ মাসে আমন ধান কাটার পর এই উৎসব আয়োজন করা হয়। কোথাও কোথাও মাঘ মাসেও নবান্ন উদযাপনের প্রথা রয়েছে। অমুসলিম রীতিতে নবান্ন অনুষ্ঠানে নতুন অন্য পিতৃপুরুষ, দেবতা, কাক ইত্যাদি প্রাণীকে উৎসর্গ করে এবং আত্মীয়-স্বজনকে পরিবেশন করার পর গৃহকর্তা ও পরিবারবর্গ নতুন গুড়সহ নতুন অন্ন গ্রহণ করেন। নতুন চালের তৈরি খাদ্যসামগ্রী কাককে নিবেদন করা নবান্নের অঙ্গ, এটি একটি বিশেষ

লৌকিক প্রথা। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী কাকের মাধ্যমে ওই খাদ্য মৃতের আত্মার কাছে পৌঁছে যায়। ঐ নৈবেদ্যকে বলে 'কাকবলী'। অতীতে পৌষসংক্রান্তির দিনেও গৃহদেবতাকে নবান্ন নিবেদন করার প্রথা ছিল।

হিন্দু ধর্মালম্বীদের প্রাচীন কথাগুলোর একটি হচ্ছে নবান্ন উৎসব। সনাতনী শাস্ত্রে নবান্ন উৎসবের কথা বলা হয়েছে এবং করণীয় কার্যক্রমের দিকনির্দেশনা রয়েছে। সনাতনী ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, নতুন ধান ফলনের সময় পিতৃপুরুষেরা অন্ন প্রার্থনা করেন। যার ফলে সনাতনীরা পার্বণ নিয়ম অনুযায়ী নবান্নে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান পালন করে থাকেন। ধর্মীয় বিশ্বাস মতে নবান্ন শ্রাদ্ধ জ্ঞাপন করা না হলে নতুন ধান গ্রহণ করলে পাপের অংশীদারী হতে হবে।

একদা অত্যন্ত সাড়ম্বরে নবান্ন উৎসব পালিত হত, সকল মানুষের সবচেয়ে অসাম্প্রদায়িক উৎসব হিসেবে নবান্ন উৎসব সমাদৃত ছিল। ১৯৯৮ সাল থেকে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরে আনুষ্ঠানিকভাবে নবান্ন উৎসব উদযাপন শুরু হয়।

পহেলা বৈশাখ : নতুন বছরের উৎসবের সঙ্গে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কৃষ্টি ও সংস্কৃতির নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। গ্রামে মানুষ ভোরে ঘুম থেকে ওঠে, নতুন জামা কাপড় পরে এবং আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে বেড়াতে যায়। বাড়িঘর পরিষ্কার করা হয় এবং মোটামুটি সুন্দর করে সাজানো হয়। বিশেষ খাবারের ব্যবস্থাও থাকে। কয়েকটি গ্রামের মিলিত এলাকায়, কোনো খোলা মাঠে আয়োজন করা হয় বৈশাখী মেলার। এই বৈশাখী মেলায় সাধারণত কুটির শিল্পের পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রয় করা হয়। এছাড়াও দেশীয় পিঠার সমাহার দেখা যায় এই মেলায়। এই মেলার অন্যতম আকর্ষণ হল পান্তা ভাত ও ইলিশ মাছ। বিভিন্ন স্থানে প্রতিযোগিতামূলক নৌকাবাইচ, লাঠিখেলা অথবা কুস্তি খেলার আয়োজন দেখতে পাওয়া যায়। বাংলাদেশে এরকম কুস্তির সবচেয়ে বড় আসরটি হয় ১২ বৈশাখ, চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে, যা জব্বারের বলি খেলা নামে জনপ্রিয়।

ঢাকাতে উদযাপিত পহেলা বৈশাখের একটি অপরিহার্য অংশ হচ্ছে মঙ্গল শোভাযাত্রা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে পহেলা বৈশাখের সকালে এই শোভাযাত্রাটি বের হয়ে শহরের নানা সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় চারুকলা ইনস্টিটিউটে এসে সমাপ্তি ঘটে। ঐতিহ্যবাহী এই মঙ্গল শোভাযাত্রার মাধ্যমে গ্রাম বাংলার জীবনকে তুলে ধরা হয়। সকল শ্রেণীর মানুষের অংশগ্রহণে মঙ্গল শোভাযাত্রাটি আনন্দমুখর হয়ে ওঠে। এই শোভাযাত্রা কে কেন্দ্র করে তৈরি করা হয় রংবেরঙের মুখোশ এবং নানা শ্রেণীর প্রাণীর প্রতিকৃতি। ১৯৮৯ সাল থেকে এ মঙ্গল শোভাযাত্রা পহেলা বৈশাখ উৎসবের একটি অন্যতম আকর্ষণ হিসেবে উদযাপিত হয়ে আসছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেকে এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে।

পৌষসংক্রান্তি : বাংলাদেশে বিভিন্ন উৎসবের মধ্যে অন্যতম একটি উৎসব হলো পৌষসংক্রান্তি। বাংলা পৌষ মাসের শেষের দিকে এ উৎসব পালিত হয়। এই দিনে পিঠা খাওয়া,ঘূড়ি ওড়ানো,প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। সারাদিন ঘূড়ি উড়ানোর পর সন্ধ্যার দিকে পটকা ফুটিয়ে আর ফানুস উড়িয়ে উৎসবের শেষ হয়। এই মেলার বিশেষ একটি আকর্ষণ বাউল গান। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ায় এই দিবস বা ক্ষণকে ঘিরে অনুষ্ঠিত হয় উৎসব।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গে মকরসংক্রান্তি বা পৌষসংক্রান্তিতে নতুন ফসলের উৎসব ‘পৌষ-পার্বণ’ পালিত হয়। নতুন ধান,খেঁজুরের গুড় আর পাটালি দিয়ে নানা ধরনের ঐতিহ্যবাহী পিঠা বানানো হয়। পৌষ পার্বণ বা পিঠা পার্বণ পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত একটি হিন্দু লোক উৎসব। হিন্দুরা এ দিনে পিঠা তৈরি করে দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করেন। মধ্যযুগের বাংলা মঙ্গলকাব্যে বিভিন্ন প্রকার পিঠে ও পিঠে গড়ার বিচিত্র সব উপাখ্যানের উল্লেখ রয়েছে।

হালখাতা : আমাদের সমাজে এখনো হালখাতা অনুষ্ঠানটি প্রচলিত আছে। এটি মূলত ব্যবসায়ী মহল পালন করে থাকে। নববর্ষের দিন ব্যবসায়ীরা পুরনো বছরের হিসাব নিকাশ সমাধান করেন। এজন্য অনেকে লাল

কাপড়ের মলাটের একটি বিশেষ ধরনের খাতা ব্যবহার করেন, যাকে বলা হয় খেরো খাতা। এই দিনে ব্যবসায়ীগণরা ক্রেতাদের মিষ্টিমুখ করান। এছাড়া সাধারণ লোকদের মধ্যেও অনেকেই আজকাল নববর্ষ উপলক্ষে মিষ্টি সহ বিশেষ খাবারের আয়োজন করেন। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান নববর্ষের শুভেচ্ছা হিসেবে মক্কেলদের বই উপহার দেন।

পূণ্যাহ : পূণ্যাহ ছিল মূলত রাজস্ব আদায়ের একটি উৎসব। বিলুপ্তপ্রায় উৎসব গুলোর মধ্যে এটি একটি। এটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় প্রাক ব্রিটিশ সময়ে যেখানে মূলত রাজস্ব আদায় এবং বন্দোবস্ত-সংক্রান্ত বিষয় জড়িত থাকে। এ ব্যবস্থায় সরকার কর্তৃক প্রত্যেক জমিদার, তালুকদার, ইজারাদারসহ অন্যান্য রাজস্ব প্রদানকারী ব্যক্তিদের বছরের একটি নির্দিষ্ট দিনে অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণের মাধ্যমে পূর্ববর্তী বছরের রাজস্ব আদায় এবং নতুন বছরের বন্দোবস্ত প্রদানের ব্যবস্থা করা হতো।

দুর্গোৎসব : প্রাচীন উৎসব গুলোর মধ্যে অন্যতম একটি উৎসব হলো দুর্গাপূজা। এই উৎসবটি কত প্রাচীন সে বিষয়ে নির্দিষ্ট তথ্য নেই। অতীতে অনুষ্ঠিত দুর্গাপূজার রূপ প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। আমাদের দেশে প্রচলিত দুর্গাপূজা সম্পূর্ণটাই এদেশীয় রীতিতে অনুষ্ঠিত হয়, তবে প্রাচীন পদ্ধতির সাথে শারদীয় উৎসবের মিল রয়েছে। যেটি অকালবোধন নামে অধিক পরিচিত। প্রাচীনকালে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হতো বসন্তকালে, মূলত এটি ছিল দেবী দুর্গার পূজার জন্য উপযুক্ত সময়, তবে শারদীয় পূজার প্রচলন হয় কৃত্তিবাসের রামায়ণের রাম কর্তৃক অকালে (শরৎকালে) দেবীর পূজা করার মধ্য দিয়ে। আমাদের দেশে শারদীয় দুর্গোৎসব একটি সার্বজনীন রূপ ধারণ করেছে। এই উৎসবে মূলত সকলেই অংশগ্রহণ করতে পারে, যার ফলশ্রুতিতে এটি একটি আনন্দমুখর উৎসব পরিণত হয়।

মেলা : মেলা হলো বাংলাদেশের লৌকিক ও পরিচিত উৎসব। এদেশে মেলার উৎপত্তি হয়েছে গ্রাম-সংস্কৃতি থেকে। এ মেলার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে নির্দিষ্ট স্থানে, নির্দিষ্ট তারিখ বা তিথিলগ্নে এক একটি মেলাতে নর-নারী, শিশু-কিশোরসহ বয়স্ক লোকেদের সমাগম ঘটে। তবে এ মেলার

একটি বিশেষ আকর্ষণ হচ্ছে– ব্যবহারকৃত পণ্য ও গৃহসামগ্রীর বহু সমাবেশ এবং চিত্তবিনোদনের জন্য যাত্রা, সার্কাস, পুতুলনাচ ইত্যাদির আসর। বাংলাদেশের প্রচলিত মেলার সংখ্যা সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না। তবে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থার জরিপ অনুসারে মোট মেলার সংখ্যা ১০০৫ টি। এ সমস্ত মেলার প্রায় নব্বই ভাগই গ্রামীণ লোক মেলা। বাংলাদেশের লোক মেলা সাধারণত শুখনো মৌসুমে অথবা শীতকালেই অনুষ্ঠিত হয়। সারা বছরই দেশের কোনো না কোনো জায়গায় মেলা বসে ভিন্ন ভিন্ন উপলক্ষকে কেন্দ্র করে।

উপরোক্ত উৎসব সমূহ ছাড়াও লোকসমাজের প্রচলিত খেলাধুলা, লোকসংগীত, নৌকাবাইচ প্রভৃতি অনুষ্ঠান রয়েছে, সেগুলোতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেকেই আনন্দের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে। এসব লোকজ উৎসব দিন দিন অবহেলার শিকার হচ্ছে। তাই বাংলার লোকজ সংস্কৃতির ধারাকে অব্যাহত রাখতে অবশ্যই এ সমস্ত লোকজ উৎসবের আয়োজনের প্রতি আন্তরিক হতে হবে।

উপসংহার : উৎসব মানুষকে নতুনভাবে উজ্জীবিত করে। জীবনের একঘেয়েমি, ক্লান্তির সমাপ্তি ঘটিয়ে এনে দেয় বৈচিত্র্যময় আনন্দ। সেই আনন্দ প্রত্যেকে ভাগাভাগি করে নেওয়ার মধ্যে উৎসবের সত্যিকার সার্থকতা। বাংলাদেশে যতগুলো লোকজ উৎসব রয়েছে, সবই এদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একটি অংশ। তাই সমাজের প্রত্যেক সচেতন ও সংস্কৃতিবান মানুষকে এই লোকজ উৎসবগুলো রক্ষায় এগিয়ে আসতে হবে।